বাংলাদেশ শ্রম আইন

প্রেক্ষাপট, বাস্তবতা ও উন্নয়নে করণীয়

BANGLADESH INSTITUTE OF LABOUR STUDIES-BILS
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স

বাংলাদেশ শ্রম আইন

প্রেক্ষাপট, বাস্তবতা ও উন্নয়নে করণীয়

BANGLADESH INSTITUTE OF LABOUR STUDIES-BILS
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স

সূচি

ভূমিকা	০৩
শ্রম আইনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	০৫
শ্রম আইন তৈরির প্রক্রিয়া ও ইতিহাস	০৭
বিল্‌স এর ভূমিকা	০৯
শ্রম আইনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১১
২০১৩ ও ২০১৮ সালের সংশোধিত শ্রম আইন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	১৯
বর্তমান শ্রম আইন এবং ভবিষ্যৎ করণীয়	২১
ভবিষ্যৎ এডভোকেসি'র ক্ষেত্র	২৩

ভূমিকা

'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে- এটাই সবার কাম্য। একটি দীর্ঘ অভিযাত্রার মধ্য দিয়ে ২০০৬ সালে দেশে শ্রম সংক্রান্ত ২৫টি আইনকে সমন্বিত করে এই শ্রম আইন তৈরি করা হয়। আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ ও শ্রম আইন বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ ও মতামত গ্রহণ করা হলেও আইন প্রণয়নের পর দেখা যায় শ্রমিক অধিকারের মৌলিক ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মানদন্ডসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই অনুসরণ করা হয়নি; পাশাপাশি, দেশের সকল শ্রমিকের সুরক্ষার নিশ্চয়তাও এই আইনে প্রদান করা হয়নি। ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পক্ষ থেকে একটি গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়নের দাবি অব্যাহত থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালের পর থেকে সরকারের উদ্যোগে শ্রম আইনের প্রতিটি সংশোধনী প্রক্রিয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পক্ষ থেকে দেশের সংবিধান, জাতীয় শ্রমনীতি এবং শ্রমিক অধিকার ও মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘোষণা, চুক্তি, কনভেনশন, রিকমেন্ডেশন ও প্রটোকলসমূহের আলোকে বিভিন্ন সংশোধনী প্রস্তাব সরকারের নিকট পেশ করা হয়। কিন্তু আইন সংশোধনের পর দেখা যায় এসব প্রস্তাবনার অধিকাংশই বিবেচনা করা হয়নি। পক্ষান্তরে, শ্রম আইনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যের সন্নিবেশ ঘটিয়ে ব্যাপকভিত্তিতে আউটসোর্সিংকে উৎসাহিত করা হয়। পাশাপাশি সর্বজনস্বীকৃত ও শ্বাশ্বত অনেক অধিকার খর্ব করা হয়। এই প্রেক্ষিতে দেশের সকল শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষায় একটি গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়নের দাবি অব্যাহত রাখা অত্যন্ত জরুরী।

আমরা মনে করি, দেশের সকল ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক ও মানবাধিকার সংগঠনের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই দেশের সকল শ্রমিকের আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এই প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে যাঁরা সম্পৃক্ত হবেন তাঁদের অবশ্যই শ্রম আইনের পূর্বাপর বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই উপলব্দি থেকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স শ্রম আইন সম্পর্কিত এই বুকলেট প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছে। এই বুকলেট শ্রমিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ও সহায়ক সকল মানুষকে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে পথ নির্দেশ করতে পারবে।

এই বুকলেটে সংক্ষিপ্ত পরিসরে শ্রম আইনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, শ্রম আইন তৈরির প্রক্রিয়া ও ইতিহাস, বিল্‌স এর ভূমিকা, শ্রম আইনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ১৯৯৪ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সরকারের নিকট উত্থাপিত সকল সুপারিশের সার সংক্ষেপ, প্রদত্ত সুপারিশের আলোকে ২০১৩ ও ২০১৮ সালের শ্রম আইন সংশোধনী পর্যালোচনা, শ্রম আইনের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও ঘাটতি এবং শ্রমিকবান্ধব আইন হিসেবে শ্রম আইন উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে কোন কোন বিষয়ে এডভোকেসি করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

আমরা প্রত্যাশা করি- সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণ ও প্রচেষ্টায় ধোঁয়াশা ও ত্রুটিমুক্ত একটি গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণীত হবে এবং উৎপাদন ও মুনাফার সকল ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য হিস্যা প্রতিষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রের সাংবিধানিক অঙ্গীকার পূরণ, বাংলাদেশে একটি ন্যায্য শিল্প সম্পর্ক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি ২০৩০ সালের মধ্যে শোভন কাজসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যান্য লক্ষ্য অর্জন করতে হলে শ্রমজীবি সকল মানুষকে শ্রম আইনের সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে হবে- এটি আজ সময়ের দাবি।

শ্রম আইনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের শ্রম আইন ব্যবস্থা শত বছরের বেশি সময়ের পুরনো। ইংরেজ আমলে ১৮৮১ সালে এই ভারত উপমহাদেশে প্রথম শ্রম আইন পাশ হয়। পরবর্তীতে ইংরেজ সরকার শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে; যেমন- শ্রম ঘন্টা, শিশুদেরকে কাজে নিয়োগ, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম, মজুরি ইত্যাদি। কারখানা আইন (১৮৮১), শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ আইন (১৯২৩), ট্রেড ইউনিয়ন আইন (১৯২৬), শিল্প বিরোধ আইন (১৯২৯), মজুরি পরিশোধ আইন (১৯৩৬), মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন (১৯৩৯) এবং শিশু শ্রম আইন (১৯৩৮) - এসব আইন ইংরেজ আমলে প্রণীত শ্রম আইনসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ ভাগ হওয়ার পর পাকিস্তান সরকার বিভক্তিপূর্ব সময়ে প্রণীত প্রায় সকল আইন কিছু আধুনিকত্ব ও সংশোধন সাপেক্ষে প্রশাসনিক বিধিমালা হিসেবে বলবৎ রাখে। শ্রম আইনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য একটি আইন হচ্ছে পাকিস্তান আমলে প্রণীত ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ আইন অধ্যাদেশ (রাষ্ট্রপতির ৪৮ নং আদেশ)' দ্বারা পূর্ববর্তী আইনসমূহ বলবৎ রাখে। এর সাথে সাথে দেশের পরিবর্তিত অবস্থা ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে আরও কিছু আইন প্রণয়ন করা হয়। ২০০৬ সালের ১১ অক্টোবর বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর গেজেট প্রকাশিত হয় (২০০৬ সনের ৪২নং আইন)। শ্রমিক নিয়োগ, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক, সর্বনিম্ন মজুরির হার নির্ধারণ, মজুরি পরিশোধ, কার্যকালে দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিকের জখমের জন্য ক্ষতিপুরণ, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, শিল্প বিরোধ উত্থাপন ও নিষ্পত্তি, শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কল্যাণ ও চাকুরীর অবস্থা ও পরিবেশ এবং শিক্ষাধীনতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিদ্যমান সকল আইনের সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে প্রণীত হয় বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬। বাংলাদেশ শ্রম আইন একটি সমন্বিত আইন। দেশের ২৫টি পূর্ববর্তী শ্রম সংক্রান্ত আইনকে সন্নিবেশ করে হালনাগাদ করে এই আইনটি তৈরি করা হয়েছে।

পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় গেজেট প্রজ্ঞাপনের দ্বারা এই আইনে কিছু কিছু সংশোধনী আনা হয়- তবে উল্লেখযোগ্য সংশোধনী আনা হয় ২২ জুলাই ২০১৩ এবং ২১ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে। ২০১৩ ও ২০১৮ সালের সংশোধন প্রক্রিয়ায় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদে ব্যাপক আলোচনা করা হয়। শ্রম আইন সংশোধনের জন্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে ২০১৩ সালে সংঘটিত রানা প্লাজা ভবন ধসে উত্থাপিত কারখানা ও শ্রমিকের নিরাপত্তা ইস্যু, শ্রমমান পরিপালনের বিষয়ে আইএলও'র পর্যবেক্ষণ, শ্রমিক পক্ষের অব্যাহত দাবি ইত্যাদি।

শ্রম আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫' প্রণীত হয়েছে। শ্রম বিধিমালায় বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ফরম এবং তফসিল বর্ণিত হয়েছে। ৩৬৭টি বিধি, ৭টি তফসিল এবং ৮১টি ক্রমিকে বিভিন্ন ফরম-এর নমুনা প্রদান করা হয়েছে।

শ্রম আইন তৈরির প্রক্রিয়া ও ইতিহাস

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের এখতিয়ার রাখে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সাংবিধানিক অঙ্গীকার, নীতিমালার নির্দেশনা এবং জনগণের আকাঙ্খা ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে নতুন নতুন আইনকানুন তৈরি করে এবং পুরানো আইনকানুন সংশোধন করে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পরও ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে প্রণীত শ্রম সংক্রান্ত আইন ও বিধি দ্বারা বাংলাদেশের শ্রমখাত পরিচালিত হতে থাকে। এ সময় শ্রম সংক্রান্ত প্রায় ৫০টি আইন প্রচলিত ছিল এবং সঙ্গত কারণেই একেক আইনের একেক রকম ব্যাখ্যা উত্থাপিত হতো। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য লেবার কোর্ট বার এসোসিয়েশন ১৯৯০ সালে সরকারের নিকট জটিলতামুক্ত একটি সমন্বিত আইন প্রণয়ের সুপারিশ করে। এই সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি এবং শ্রম বিশেষজ্ঞদের নিয়ে 'শ্রম আইন কমিশন, ১৯৯২' গঠন করে। এই কমিশন ৩১ মার্চ, ১৯৯৪ তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রতিবেদন দাখিল করে।

এরপর মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর ১১ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে সরকার বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করে। এই শ্রম আইনে শ্রম সংক্রান্ত প্রধান প্রধান ২৫টি আইনকে একীভূত করা হয়। আইনটি প্রণয়নের পূর্বে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আইনের খসড়া তৈরির ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনটি পর্যালোচনা করা হয়।

এটাই প্রত্যাশিত যে দেশের প্রধান শ্রম আইন দেশের সংবিধানে বর্ণিত শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির অঙ্গীকারকে বাস্তবে প্রতিফলিত করবে; পাশাপাশি জাতীয় শ্রমনীতি'র উদ্দেশ্য পূরণে মূল সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখবে। এছাড়া জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও আইএলও কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়নে মূল হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। তবে, বাংলাদেশ শ্রম আইন অনেকাংশে আধুনিক হলেও এতে বাংলাদেশের সংবিধান ও জাতীয় শ্রমনীতি এবং সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও আইএলও কনভেনশনসমূহ বিশেষভাবে ৮৭ ও ৯৮ নং কনভেনশনের অঙ্গীকার ও নির্দেশনাসমূহের যথাযথ প্রতিফলন না হওয়ায় দেশের

অভ্যন্তরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু থেকেই এই আইন তৈরির প্রক্রিয়ায় যুক্ত থেকে একটি ন্যায্য শ্রম আইন প্রণয়নের দাবিতে সরকারকে অব্যাহতভাবে যুক্তিপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করে গেছে; আবার, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা- আইএলও'র বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের পর্যবেক্ষণ দ্বারা সরকারকে শ্রম আইনের অসঙ্গতি দূর করে শ্রমিক স্বার্থের অনুকূলে শ্রম আইন সংশোধনের চাপ অব্যাহত রেখেছে।

উপরোক্ত প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক ২০১৩ ও ২০১৮ সালে শ্রম আইনে কতিপয় সংশোধনী আনা হয়েছে। তবে সংশোধনীতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দাবি ও প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় পুন:সংশোধনীর দাবি অব্যাহত আছে।

বিল্‌স এর ভূমিকা

১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিল্‌স শ্রম আইনের উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের সংবিধান, শ্রমনীতি এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রমমানের আলোকে শ্রম আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের জন্য বিল্‌স সরকারের নিকট বিভিন্ন সময় গবেষণা ভিত্তিক যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবনা দাখিল করেছে। প্রস্তাবনা তৈরির জন্য বিল্‌স এর উদ্যোগে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনসমূহের কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে সুপারিশ সংগ্রহ করেছে।

পাশাপাশি বিল্‌স সহযোগী জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনসমূহ এবং শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপকে শ্রম আইন বিষয়ক প্রস্তাবনা তৈরির ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে।

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম ও গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক এর সচিবালয় হিসেবে ফোরাম ও নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে বিল্‌স দেশের নেতৃত্বশীল মানবাধিকার, শ্রমিক অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সাথে যৌথভাবে সরকারের নিকট শ্রম আইন সংশোধনের প্রস্তাবনা দাখিল করেছে। এছাড়াও লেবার কোর্ট বার এসোসিয়েশনের আইনজীবিদের নিয়ে কয়েকটি কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে সংশোধন প্রস্তাব তৈরি করে লেবার কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সাথে যৌথভাবে সরকারের নিকট প্রস্তাবনা দাখিল করেছে।

বিল্‌স এর উদ্যোগে শ্রম নীতি ও শ্রম আইন নিয়মিত পর্যালোচনা ও সুপারিশ তৈরির লক্ষ্যে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, মানবাধিকার ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও শ্রম আইন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি 'ওয়ার্কিং কমিটি' গঠন করা হয়েছে এবং এই ওয়ার্কিং কমিটি দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়মিত সভা আয়োজনের মাধ্যমে শ্রম সংক্রান্ত নীতি ও আইন পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রণয়নের কাজ করে যাচ্ছে।

ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ-টিসিসি'র শ্রমিক পক্ষের সম্মানিত সদস্যগণকে ত্রিপক্ষীয় সভায় কার্যকর ভূমিকা পালনে সহযোগিতা করতে বিল্‌স এর উদ্যোগে নিয়মিত বিভিন্ন মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রম আইন সংশোধনের প্রস্তাবনাসমূহ যুক্তি সহকারে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি তাঁদেরকে শ্রম আইন সংশোধনী প্রস্তাবের যুক্তিসমূহের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করা হয়।

২০০৩ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিল্‌স সরকারের আমন্ত্রণে শ্রম আইনের খসড়া তৈরি সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছে। শ্রম আইন সংশোধনের বিষয়ে বিল্‌স একাধিকবার এতদসংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির শুনানীতে অংশ নিয়েছে এবং জ্যেষ্ঠ কয়েকজন মন্ত্রীর সাথে মতবিনিময় করেছে।

পাশাপাশি, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রেও বিল্‌স জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনসমূহকে সম্পৃক্ত করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করেছে। দেশের খ্যাতনামা শ্রমিক অধিকার ও মানবাধিকার সংগঠন এবং বিভিন্ন শ্রম খাতে কর্মরত শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করে সুপারিশ গ্রহণ করেছে এবং বিধিমালায় অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে।

শ্রম আইনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শ্রম আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। এই আইনে মালিক ও শ্রমিকের অধিকার ও দায়দায়িত্ব এবং সরকারের দায়িত্বের স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আইনটিতে ২১টি অধ্যায়, ৩৫৪টি ধারা এবং ৫টি তফসিল রয়েছে।
এই আইনের প্রথম অধ্যায়ের ধারা ২ এ রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধারা ৩ থেকে ধারা ৩৩ পর্যন্ত রয়েছে 'নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী' সংক্রান্ত বিধি-বিধান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- চাকুরীর শর্তাবলী, নিয়োগ পত্র ও পরিচয়পত্র, সার্ভিস বহি, ছুটির পদ্ধতি ও অব্যয়িত ছুটির মজুরি প্রদান, কাজ ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা, লে-অফ ও লে-অফকৃত শ্রমিকগণের ক্ষতিপূরণ, মৃত্যুজনিত সুবিধা, ছাঁটাই, ডিসচার্জ, অসদাচরণ এবং দন্ড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শাস্তি ও শাস্তির পদ্ধতি, চাকুরীর অবসান, অবসর, ভবিষ্য তহবিল পরিশোধ, শ্রমিকের চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধের মেয়াদ, চাকুরীর প্রত্যয়ন পত্র, বাসস্থান হইতে উচ্ছেদ এবং অভিযোগ পদ্ধতি ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়ে ধারা ৩৪ থেকে ধারা ৪৪ পর্যন্ত কিশোর ও প্রতিবন্ধি শ্রমিক নিয়োগ, তাদের কর্মঘন্টা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ধারা ৪৫ থেকে ধারা ৫০ পর্যন্ত 'প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা' প্রসঙ্গে বিধি-বিধান রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- নারী শ্রমিকের কর্মের ধরন, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধার পরিমাণ ও পরিশোধ পদ্ধতি, নারী শ্রমিকের চাকুরীর অবসানে বাধা ইত্যাদি।

পঞ্চম অধ্যায় ধারা ৫১ থেকে ধারা ৬০ পর্যন্ত 'স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা' সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেমন- পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা, ধুলা-বালি ও ধোঁয়া, বর্জ্য পদার্থ অপসারণ, কৃত্রিম আর্দ্রকরণ, অতিরিক্ত ভীড়, আলোর ব্যবস্থা, পান করার পানি, প্রক্ষালন কক্ষ ইত্যাদি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'নিরাপত্তা' সংক্রান্ত ধারা ৬১ থেকে ধারা ৭৮ পর্যন্ত যেসব বিষয়ে বিধি-বিধান রয়েছে সেগুলো হচ্ছে- ভবন ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা, অগ্নিকান্ডের ক্ষেত্রে সতর্কতা, যন্ত্রপাতির নিকটে কাজ করার সময় সতর্কতা, মেঝে, সিড়ি এবং যাতায়াত পথ, অতিরিক্ত ওজন, চোখের নিরাপত্তা, বিস্ফোরক বা দাহ্য গ্যাস, ধূলা ও বিপজ্জনক ধোঁয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি।

সপ্তম অধ্যায়ে ধারা ৭৯ থেকে ধারা ৮৮ পর্যন্ত 'স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য বিধি ও নিরাপত্তা' সম্পর্কে বিশেষ বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- বিপজ্জনক চালনা, দুর্ঘটনা সম্পর্কে নোটিশ প্রদান, ব্যাধি সম্পর্কে নোটিশ, দুর্ঘটনা বা ব্যাধি সম্পর্কে তদন্ত, বিপজ্জনক ভবন এবং যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে তথ্য প্রদান, কতিপয় কাজে মহিলাগণের নিয়োগে বাধা-নিষেধ ইত্যাদি।

অষ্টম অধ্যায়ে ধারা ৮৯ থেকে ৯৯ পর্যন্ত 'কল্যাণ মূলক ব্যবস্থা' সংক্রান্ত বিধি-বিধান রয়েছে, যেমন- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, সেইফটি রেকর্ড বুক সংরক্ষণ, ধৌতকরণ সুবিধা, খাবার কক্ষ, শিশুকক্ষ, চা-বাগানে বিনোদন, শিক্ষা, গৃহায়ন, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ইত্যাদি প্রাপ্তির সুবিধা, সংবাদপত্র শ্রমিকের জন্য চিকিৎসা পরিচর্যা, বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালুকরণ ইত্যাদি।

নবম অধ্যায়ে ধারা ১০০ থেকে ধারা ১১৯ পর্যন্ত 'কর্মঘন্টা ও ছুটি সংক্রান্ত বিধি-বিধান' বর্ণিত হয়েছে, যেমন- দৈনিক কর্মঘন্টা, বিশ্রাম বা আহারের জন্য বিরতি, সাপ্তাহিক কর্মঘন্টা, সাপ্তাহিক ছুটি, ক্ষতিপূরণমূলক সাপ্তাহিক ছুটি, কর্ম সময়ের সম্প্রসারণ, রাতের বেলায় কাজ, ওভারটাইম বা অধিকাল কর্মের জন্য অতিরিক্ত ভাতা, মহিলা শ্রমিকের জন্য সীমিত কর্মঘন্টা, দ্বৈত চাকুরীর উপর বাধা, নোটিশ এবং রেজিস্টারের সহিত কর্মঘন্টার মিল থাকা, দোকান বন্ধ রাখা, নৈমিত্তিক ছুটি, পীড়া ছুটি, মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটি, উৎসব ছুটি, ছুটি অথবা বন্ধের সময়ের মজুরি হিসাব ও প্রদান ইত্যাদি।

দশম অধ্যায়ে ধারা ১২০ থেকে ধারা ১৩৭ পর্যন্ত 'মজুরি ও উহার পরিশোধ' সম্পর্কে বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- মজুরির বিশেষ সংজ্ঞা, মজুরি পরিশোধের দায়িত্ব, মজুরি-কাল স্থিরিকরণ, মজুরি পরিশোধের সময়, মজুরি আদায়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ভূমিকা, মজুরি হইতে কর্তনযোগ্য বিষয়াদি, মজুরি হইতে কর্তন বা মজুরি বিলম্বে পরিশোধের কারণে উত্থিত দাবী ইত্যাদি।

একাদশ অধ্যায়ে ধারা ১৩৮ থেকে ধারা ১৪৯ পর্যন্ত 'মজুরি বোর্ড' সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- নিম্নতম মজুরি বোর্ড প্রতিষ্ঠা, নিম্নতম মজুরি হারের সুপারিশ, সুপারিশ প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়, নিম্নতম মজুরি হারের পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা, নিম্নতম মজুরি প্রদানে মালিকের দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি।

দ্বাদশ অধ্যায়ে ধারা ১৫০ থেকে ধারা ১৭৪ পর্যন্ত 'দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের জন্য শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ' প্রসঙ্গে বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে যেমন- ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য মালিকের দায়িত্ব, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, ক্ষতিপূরণ বন্টন, নোটিশ ও দাবী, মারাত্মক দুর্ঘটনা, চিকিৎসা পরীক্ষা ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ধারা ১৭৫ থেকে ধারা ২০৮ পর্যন্ত 'ট্রেড ইউনিয়ন এবং শিল্প সম্পর্ক' বিষয়ে বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- মালিক ও শ্রমিকের

ট্রেড ইউনিয়ন, রেজিস্ট্রিকরণের জন্য দরখাস্ত, দরখাস্তের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি, রেজিস্ট্রিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হওয়ার অযোগ্যতা, রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক রেজিস্টার, ইত্যাদি সংরক্ষণ, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রিকরণ, সভাপতি ও কতিপয় কর্মকর্তাকে বদলী না করা, রেজিস্ট্রি বাতিলকরণ, রেজিস্ট্রিকরণ ব্যতীত কোন ট্রেড ইউনিয়নের কাজ না চালানো, দ্বৈত সদস্য পদের উপর বাধা, রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়নের সংবিধিবদ্ধ হওয়া, মালিকের পক্ষে অসৎ শ্রম আচরণ, শ্রমিকের পক্ষে অসৎ শ্রম আচরণ, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের রেজিস্ট্রিকরণ, যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি, চেকঅফ, অংশগ্রহণকারী কমিটি, অংশগ্রহণকারী কমিটির কাজ, সভা ও অংশগ্রহণকারী কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

চতুর্দশ অধ্যায়ে ধারা ২০৯ থেকে ২৩১ পর্যন্ত 'বিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রম আদালত, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, আইনগত কার্যধারা, ইত্যাদি' বিষয়ে বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- শিল্প বিরোধ উত্থাপন ও নিষ্পত্তি, ধর্মঘট ও লক-আউট, শিল্প বিরোধের ক্ষান্তি, শ্রম আদালতে দরখাস্ত, শ্রম আদালতের ক্ষমতা ও কার্যক্রম, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, মামলায় পক্ষগণের উপস্থিতি, মামলার খরচ, কার্যধারার সময়সীমা, কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকাকালে ধর্মঘট বা লক-আউটের নোটিশ জারীর উপর বাধা-নিষেধ, শ্রম আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ধর্মঘট বা লক-আউট নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা, বেআইনী ধর্মঘট ও লক-আউট, কতিপয় ব্যক্তির অধিকার রক্ষণ, পক্ষগণের প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে ধারা ২৩২ থেকে ২৫২ পর্যন্ত 'কোম্পানীর মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ' প্রসঙ্গে বিধি-বিধান রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- যেসকল সেক্টর এই অধ্যায় থেকে অব্যাহতি পাবে, অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল স্থাপন, তহবিলদ্বয়ের ব্যবস্থাপনা, অংশগ্রহণ তহবিলের বিনিয়োগ, সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা, অংশগ্রহণ তহবিলের ব্যবহার, কল্যাণ তহবিলের ব্যবহার, ট্রাস্টি বোর্ডের অবস্থান ও কাজ ইত্যাদি।

সপ্তদশ অধ্যায়ে ধারা ২৬৪ থেকে ২৭৩ পর্যন্ত 'ভবিষ্য তহবিল' সম্পর্কিত বিধি-বিধান রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- বেসরকারী খাতে প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণের জন্য ভবিষ্য তহবিল, চা-বাগান শ্রমিক ভবিষ্য তহবিল, ট্রাষ্টি বোর্ড, প্রশাসন ব্যয়, চাঁদা, সংবাদপত্র শ্রমিকগণের জন্য ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদি।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে ধারা ২৭৪ থেকে ২৮২ পর্যন্ত শিক্ষাধীনতা প্রসঙ্গে বিধি-বিধান রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- ত্রিপক্ষীয় উপদেষ্টা কমিটি, মালিকের বাধ্যবাধকতা, শিক্ষাধীন শ্রমিকের বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি।

ঊনবিংশ অধ্যায়ে ধারা ২৮৩ থেকে ৩১৬ পর্যন্ত 'অপরাধ, দন্ড এবং পদ্ধতি' সম্পর্কিত বিধি-বিধান রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- শ্রম আদালতের আদেশ অমান্য করার দন্ড, শিশু ও কিশোর নিয়োগের জন্য দন্ড, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধার বিধান

লংঘনের দন্ড, অনুমোদিত অনুপস্থিতির সময়ে মজুরির বিনিময়ে কাজ করার দন্ড, নিম্নতম মজুরী হারের কম হারে মজুরি প্রদানের দন্ড, দুর্ঘটনার নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার দন্ড, অসৎ শ্রম আচরণ বা এন্টি-ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশনের দন্ড, বে-আইনী ধর্মঘট বা লক-আউটের দন্ড, বে-আইনী ধর্মঘট বা লক-আউটে প্ররোচিত করার দন্ড, ঢিমে তালের কাজে অংশগ্রহণ বা প্ররোচনার দন্ড, ভবিষ্য তহবিল এবং ট্রেড ইউনিয়ন তহবিলের অর্থ আত্মসাতের দন্ড, অরেজিস্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকান্ডের দন্ড, ট্রেড ইউনিয়নের দ্বৈত সদস্য পদের দন্ড, মিথ্যা বিবরণের দন্ড, অন্যায়ভাবে তথ্য প্রকাশের দন্ড, শ্রমিকগণের সাধারণ অপরাধের দন্ড, বাধা প্রদানের দন্ড, বিপজ্জনক পরিণতি সম্পন্ন আইন লংঘনের দন্ড, অভিযুক্তি তামাদি মামলা প্রত্যাহার ইত্যাদি।

বিংশ অধ্যায়ে ধারা ৩১৭ থেকে ৩২৩ পর্যন্ত 'প্রশাসন, পরিদর্শন, ইত্যাদি' প্রসঙ্গে বিধি-বিধান রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- শ্রম মহাপরিচালক ও মহা পরিদর্শক এর ক্ষমতা ও দায়িত্ব, জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল ইত্যাদি।

একবিংশ অধ্যায়ে 'বিবিধ' প্রসঙ্গে ধারা রয়েছে ধারা ৩২৪ থেকে ৩৫৪ পর্যন্ত। এর মধ্যে রয়েছে- অব্যাহতির ক্ষমতা, মৌসুমী কারখানা, শ্রমিকগণের দায়িত্ব, মহিলাদের প্রতি আচরণ, সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ, শ্রম আইন, বিধি এবং প্রবিধানের সার-সংক্ষেপ প্রদর্শন, তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা, কতিপয় তথ্য প্রকাশে বিধি-নিষেধ, কতিপয় বিষয়ে গোপনীয়তা, সম কাজের জন্য সম মজুরি প্রদান, সাধারণ ক্ষেত্রে কোর্ট ফিস, শ্রম আইনের উপর প্রশিক্ষণ, ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ গঠন, ট্রেড ইউনিয়নের কতিপয় কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ইত্যাদি।

পাঁচটি তফসিলের প্রথম তফসিল হচ্ছে- 'স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা সৃষ্টিকারী বলিয়া গণ্য জখমের তালিকা', দ্বিতীয় তফসিল হচ্ছে- 'নোটিশ দানযোগ্য ব্যাধির তালিকা', তৃতীয় তফসিল হচ্ছে- 'পেশাগত ব্যাধির তালিকা', চতুর্থ তফসিল হচ্ছে- 'ধারা ১৫০ (৮) এর বিধান সাপেক্ষে শ্রমিকের সংজ্ঞা- অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের তালিকা' এবং পঞ্চম তফসিল হচ্ছে- 'কতিপয় ক্ষেত্রে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ'।

১৯৯৪ থেকে শুরু করে সকল সুপারিশের সারসংক্ষেপ:

বাংলাদেশে শ্রম আইন প্রণয়ন ও পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় সংশোধন প্রক্রিয়ায় শ্রমিক পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবি ও সুপারিশ সরকারের নিকট উত্থাপন করা হয়। ১৯৯৪ সাল থেকে শুরু করে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সরকারের নিকট দাখিলকৃত শতাধিক সুপারিশ থেকে নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরা হলো:

১. সকল শ্রমিককে শ্রম আইনের আওতায় আনা: নিয়োগের ধরন, মেয়াদ, পদ নির্বিশেষে মজুরির বিনিময়ে উৎপাদন ও সেবামূলক কাজে নিয়োজিত সকল শ্রমিক এবং ইপিজেড ও প্রস্তাবিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সহ সকল শ্রমিককে শ্রম আইনের আওতায় আনা।

২. স্থায়ী কাজে অস্থায়ী শ্রমিক ও ঠিকাদারী পদ্ধতিতে শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করা: কোন প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী ধরনের কাজে অস্থায়ী ধরনের অর্থাৎ সাময়িক, দৈনিকভিত্তিক ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করা এবং ঠিকাদারী ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করা।

৩. অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রদান করা: আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর আলোকে সকল শ্রমিককে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও পছন্দমত নেতা নির্বাচনের অধিকার প্রদান করা।

৪. ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগত সীমাবদ্ধতা বিলোপ করা: ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শ্রমিক সংখ্যা ও শতকরা হারের বাধ্যবাধকতা অবলুপ্ত করা। সকল শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান ও কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা নিষেধ প্রত্যাহার করা।

৫. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে জটিলতা দূর করা: ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের জন্য শ্রমিকদের আবেদন প্রক্রিয়া সহজ ও জটিলতামুক্ত করা। নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ যেন অস্পষ্ট কোনো কারণ দেখিয়ে শ্রমিকদের আবেদন ও নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত না করতে পারে তার জন্য আইনে 'নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সন্তোষজনক মনে হওয়া'র সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা উল্লেখ করা।

৬. যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে নিবন্ধন বাতিলের ধারা বিলোপ করা: যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি নির্বাচনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রেড ইউনিয়ন ১০% এর কম ভোট পেলে ঐ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে যাবে মর্মে যে বিধানটি রয়েছে তা বিলুপ্ত করা।

৭. জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার বিধান সন্নিবেশিত করা: ক্ষুদ্র শিল্প, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতসহ সকল খাতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য মজুরি নির্ধারণের মানদন্ড ও জাতীয় ন্যুনতম মজুরি ঘোষণার বিধান যুক্ত করা।

৮. দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা: আইএলও কনভেনশন ১২১, মারাত্মক দুর্ঘটনা আইন, ১৮৫৫, রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের বিভিন্ন রায় এবং 'লস অব আর্নিং'কে ভিত্তি ধরে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা, বিদ্যমান আইনে বর্ণিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

৯. মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়সীমা বৃদ্ধি করা: সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় সকল নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাসের পরিবর্তে ৬ মাসে উন্নীত করা।

১০. শিশু শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করা: শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকার শ্রমে শিশু শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করা।

১১. শাস্তির বিধানে সমন্বয় সাধন ও মালিকের শাস্তি বৃদ্ধি করা: অপরাধের ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী শাস্তির মেয়াদ ও পরিমাণ নির্দিষ্ট করা। একই সাথে নিয়োগপত্র প্রদান না করা, মালিক কর্তৃক সাদা কাগজে শ্রমিকের স্বাক্ষর গ্রহণ, পদত্যাগ পত্রে আগাম স্বাক্ষর গ্রহণ প্রভৃতি অপরাধের জন্য মালিকের পর্যাপ্ত শাস্তির বিধান সুনির্দিষ্ট করা।

১২. নিরাপত্তা সংক্রান্ত অধ্যায়কে হালনাগাদ করা: শ্রম আইনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারাসমূহ যুগোপযোগী করা, ভবন মালিক ও কারখানা মালিক উভয়ের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা এবং অনুমোদনের দায়িত্বে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় ও যেকোন বিভাগ কর্তৃক কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোন ছাড়পত্র প্রদানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্টতা বাধ্যতামূলক করা।

১৩. শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা: শ্রম পরিদপ্তর ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর উভয়কে অধিদপ্তরে উন্নয়ন করা, উভয় অধিদপ্তরের প্রধানের পদকে যথাক্রমে মহাপরিচালক ও মহাপরিদর্শক-এ উন্নীত করা এবং পরিদর্শকদের সংখ্যা ও পরিদর্শন কার্যালয় বৃদ্ধি এবং তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

১৪. অংশগ্রহণকারী কমিটি বাতিল করা: অংশগ্রহণকারী কমিটিকে ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প হিসেবে গণ্য করার অপচেষ্টা প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের যে উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্বের আইনে অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠনের বিধান করা হয়েছিল তা প্রতিস্থাপন করা।

১৫. সকল শ্রমিকের জন্য গ্র্যাচুইটি বাধ্যতামূলক করা: কোনো শ্রমিকের চাকুরির সময়সীমা পাঁচ বছর হউক বা না হউক তার জন্য গ্র্যাচ্যুইটি বাধ্যতামূলক করা।

১৬. শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার আওতা বৃদ্ধি করা: অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকসহ সকল শ্রমিকের জন্য ভবিষ্য তহবিল বাধ্যতামূলক করা; পেনশন বীমা চালু করা এবং সকল শ্রমিকের জন্য মালিক কর্তৃক যৌথ বীমা বাধ্যতামূলক করা।

১৭. শ্রমিককে চাকুরিচ্যুত করার বিষয়ে নিয়োগকারীর একচ্ছত্র ক্ষমতা বিলোপ করা: বিভিন্ন তুচ্ছ কারণে শ্রম আইনের বিধানকে ব্যবহার করে শ্রমিককে যখন তখন চাকুরিচ্যুত করার বিষয়ে নিয়োগকারীগণ যে অবাধ ক্ষমতা ভোগ করছে তা বিলোপ করা।

১৮. চাকুরির অবসানে শ্রমিকের প্রাপ্য ও আর্থিক সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধি করা: শ্রমিকের চাকুরি যেকোনো ভাবেই অবসান হোক না কেন তাকে কোনো কারণে তার অর্জিত ও প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত না করার সুযোগ নিশ্চিত করা এবং আর্থিক সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

১৯. কারখানা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করা: নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে মালিক কর্তৃক কারখানা স্থানান্তর করা হলে এবং শ্রমিকের পক্ষে নতুন স্থানে কারখানায় যাওয়া সম্ভব না হলে সেক্ষেত্রে শ্রমিকদেরকে ইস্তফাজনিত প্রাপ্য প্রদানের পরিবর্তে শ্রমিকের প্রতি পূর্ণ বছর চাকুরির জন্য এক মাসের মজুরি (বা, গ্র্যাচুইটি যা অধিক হবে) প্রদান করা।

২০. সকল শ্রমিককে প্রতিষ্ঠানের মুনাফার অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা: শ্রম আইনে শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প এবং শতভাগ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদেরকে প্রতিষ্ঠানের মুনাফার অংশগ্রহণ হতে বঞ্চিত করা হয়েছে যা বৈষম্যমূলক; শ্রম আইন সংশোধন করে সকল সেক্টরের শ্রমিকদেরকে এ সুবিধা প্রদান করা।

২১. শ্রম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্ত করা: শ্রম আদালত থেকে শ্রমিকরা যেন অতি দ্রুত প্রতিকার পেতে পারে সেজন্য আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা বন্ধ করা।

২০১৩ ও ২০১৮ সালের সংশোধিত শ্রম আইন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

২০০৬ সালে যে শ্রম আইন পাশ করা হয় সেখানে অনেক বিষয়েই শ্রমিক আন্দোলনের প্রবল আপত্তি ছিল। কারণ, আইনটি অনেকাংশেই সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক এবং শ্রমিক অধিকার ও তাদের স্বার্থের পরিপন্থী। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে এই আইনে বেশকিছু সংশোধনী আনা হলেও কার্যত: শ্রমিকদের প্রতিকূলে চলে যায় অনেক বিধি-বিধান। সংশোধনীতে অল্প সংখ্যক কৃষি শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও গৃহশ্রমিকসহ বিভিন্ন খাতে কর্মরত বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে শ্রমিকের স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। সংজ্ঞা অংশে 'তদারকি কর্মকর্তা' যুক্ত করার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক প্রকৃত শ্রমিককে অধিকার বঞ্চিত রাখা হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের জন্য ও সার্বিকভাবে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়নি। দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের মানদন্ড নির্ধারণের প্রস্তাব করা হলেও তা সংশোধনীতে আসেনি। মালিকের অন্যায় আচরণ ও দায়িত্বে অবহেলা ইত্যাদি অপরাধের জন্য মালিকের শাস্তির বিধান সুনির্দিষ্ট করার প্রস্তাব রাখা হয়, অথচ দেখা গেছে শাস্তির বিধানে সমন্বয় সাধন করা হয়নি; শ্রমিকের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান হলেও মালিকের শাস্তি বৃদ্ধি করা হয়নি। বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ অনুযায়ী অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও পছন্দমত নেতা নির্বাচনের অধিকার রয়েছে সকল শ্রমিকের। ব্যক্তি মালিকানা নির্বিশেষে সকল শিল্প কল-কারখানায় শ্রমিকরা ইচ্ছা করলে ২০% নেতা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে নির্বাচন করতে পারবেন এই প্রস্তাব দেয়া হলেও শুধু রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের জন্য ১০% কর্মকর্তা বাইরে থেকে নির্বাচনের বিধান করা হয়। সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় সকল শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাসের পরিবর্তে ৬ মাসে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হলেও তা সংশোধনীতে আনা হয়নি। আইনে "ঠিকাদার সংস্থা রেজিস্ট্রেশন" সন্নিবেশ করার মধ্য দিয়ে মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীক শ্রেণী তৈরী হয়েছে যা দ্বারা শ্রমিকের বঞ্চনা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংশোধনীতে "প্রতিষ্ঠানে উশৃঙ্খলতা, দাঙ্গা হাঙ্গামা, অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর" যুক্ত করায় এবং 'উশৃঙ্খলতা' সম্পর্কে কোন সংজ্ঞা না দেয়ায় মালিক পক্ষ শ্রমিকদের কোনরূপ সুবিধা ছাড়া চাকুরিচ্যুত করার অবাধ অধিকার লাভ করেছে। সংশোধনীতে অংশগ্রহণকারী কমিটিকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে এই কমিটিকে ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প (বা প্রতিপক্ষ) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার

অপচেষ্টা শুরু হয়েছে। তবে, ২০১৩ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করার মধ্য দিয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

২০১৮ সালের সংশোধনীর পূর্বেও শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে সুপারিশ প্রদান করা হয়। ২০১৩ সালের সংশোধনীতে শ্রমিক পক্ষের যেসব প্রস্তাব মানা হয়নি তা ২০১৮ সালের সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং আইনে শ্রমিক স্বার্থের প্রতিকূলে যে সকল বিষয় রয়েছে সেগুলো দূরীভুত করার জন্য প্রস্তাব রাখা হলেও উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে কারখানার মোট শ্রমিকের ৩০% শ্রমিকের সমর্থনের স্থলে ২০% শ্রমিকের সমর্থনের বিধান যুক্ত করা এবং শ্রমিকদের ধর্মঘট আয়োজনের জন্য পূর্ববর্তী দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিকের সমর্থনের স্থলে ৫১ ভাগ শ্রমিকের সমর্থন লাগবে মর্মে বিধান করা ২০১৮ সালের সংশোধনীর উল্লেযোগ্য ইতিবাচক দিক। এছাড়াও এই সংশোধনীর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যথাক্রমে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা এবং ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। তবে শ্রমিকদের ছুটি, কর্মঘন্টা ও বিশ্রাম, পাওনা, প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকার ও স্বার্থ কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে।

বর্তমান শ্রম আইন এবং ভবিষ্যৎ করণীয়

নীতিগতভাবে সকল শ্রমজীবী মানুষকে শ্রম আইনের সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসার রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার থাকলেও শ্রম আইনে সকল শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে লক্ষ লক্ষ প্রকৃত শ্রমিক শ্রম আইনের সুরক্ষার আওতার বাইরে রয়ে গেছে। শ্রম আইনে "ঠিকাদার সংস্থা" যুক্ত করার মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগী একটি ব্যবসায়ীক শ্রেণী তৈরি করার সুযোগ দেয়া হয়েছে যা ভবিষ্যতে শ্রমিক শোষণ বৃদ্ধি ও শিল্প-কারখানায় অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলার আশংকা তৈরী করেছে। "প্রতিষ্ঠানে উশৃঙ্খলতা, দাঙ্গা হাঙ্গামা, অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর" ইত্যাদি অভিযোগ এনে মালিক পক্ষ শ্রমিকদের কোনরূপ সুবিধা ছাড়া চাকুরিচ্যুত করার অবাধ অধিকার লাভ করেছে। শ্রমিকের জন্য অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত হয়নি এবং কার্যত: ট্রেড ইউনিয়ন করতে ইচ্ছুক শ্রমিকদের মালিক পক্ষ কর্তৃক নানাভাবে হয়রানি করার অভিযোগ উঠছে। আবার ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ শ্রম অধিদপ্তরের এখতিয়ারের সুনির্দিষ্ট পরিসীমা সম্পর্কে আইনে সুস্পষ্ট বিধান না থাকায় ইউনিয়ন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদেরকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত জখমের কারণে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে কোন মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়নি; উপরন্তু মৃত্যুর ক্ষেত্রে দুই লক্ষ ও স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে আড়াই লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে যা শ্রমিক ও তাদের পরিবারের প্রয়োজনের নিরীখে বর্তমান বাজারে খুবই অপ্রতুল। এছাড়াও শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, মজুরি পরিশোধ, কর্মঘন্টা, ছুটি, নিয়োগপত্র প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে শ্রম আইনে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকলেও মালিক পক্ষের অবহেলা ও আইন না মানার সংস্কৃতি তৈরি হওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত শ্রমিকগণই ভুক্তভোগী ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অপরদিকে আইনের বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে মালিকের শাস্তির পরিমাণও অত্যন্ত অপ্রতুল বিধায় আইনের লংঘনও পুন:পুন ঘটেই চলেছে।

শ্রমিকের প্রতি যে অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে তার প্রতিকার বিধানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অপরদিকে শ্রম আদালত থেকে শ্রমিকের ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

এমত পরিস্থিতিতে প্রথমত: বিদ্যমান শ্রম আইনের শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা জরুরী; দ্বিতীয়ত: সাংবিধানিক অঙ্গীকার, জাতীয় শ্রমনীতিসহ শ্রম সংক্রান্ত অন্যান্য নীতি ও আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ডসমূহের আলোকে এবং আইনের বর্তমান ঘাটতি ও সীমাবদ্ধতা ও শ্রমিকের চাহিদা ও প্রত্যাশা বিবেচনায় নিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান শ্রম আইনের যথাযথ সংশোধন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শ্রমিক অধিকার ও মানবাধিকার বিষয়ে কর্মরত সংগঠনসমূহের গবেষণা এবং শ্রম ইস্যুতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ও শ্রম আইন বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। দেশের সকল শ্রমিকের সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল-ইপিজেড, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল-এসইজেড, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রমখাতে কর্মরত সকল শ্রমজীবী মানুষকে একটি সমন্বিত শ্রম আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষকে বিবেচনায় রাখতে হবে যে, আইন প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অধিকার ও সুরক্ষা বিধান করা। বিশেষ কোন শ্রেণীকে সুবিধা প্রদান করা নয়। শ্রম আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অবশ্যই ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদে শ্রমিক পক্ষের যথায়থ প্রতিনিধিত্ব ও কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে; সর্বোপরি সাধারণ শ্রমিকের প্রত্যাশার প্রতিফলন থাকতে হবে শ্রম আইনে।

ভবিষ্যৎ এডভোকেসি'র ক্ষেত্র

শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণে বিদ্যমান শ্রম আইনের ভূমিকা ও কার্যকরিতা, নাগরিক হিসেবে শ্রমিকদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণ, দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে শ্রম আইনকে একটি প্রকৃত 'গণতান্ত্রিক শ্রম আইন' হিসেবে উন্নীত করতে হবে। আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সরকারের সাথে এডভোকেসি করার মূল দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এজন্য মাঠ পর্যায়ের সাধারণ শ্রমিকদেরকে শ্রম আইন সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণা দিতে হবে এবং আইনের প্রয়োগ দ্বারা শ্রমিকগণ কিভাবে উপকৃত হচ্ছেন, কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং আইনের উন্নয়নে তাদের সুপারিশ কি কি তা তুলে আনতে হবে। অন্যদিকে, শ্রম আইনের প্রয়োগ ও আইনগত সীমাবদ্ধতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে শ্রম আইনের সামঞ্জস্যতা বিধান ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গণতান্ত্রিক শ্রম আইনের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক পরিসরে গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণার ফলাফল নিয়ে সরকারের সাথে এডভোকেসি অব্যাহত রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহকে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে ইতিবাচক ফলাফল আনার জন্য সরকারের সাথে অব্যাহতভাবে লবি ও এডভোকেসি পরিচালনার সুপারিশ করা হচ্ছে:

- সাংবিধানিক অঙ্গীকার, শ্রমনীতি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রমিক অধিকারের আলোকে শ্রম আইনের বিধি-বিধান সংশোধন করা।
- ইপিজেড ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকসহ দেশের সকল শ্রমিককে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা।
- ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে শ্রম আইনের সংশোধন করা।
- সকল শ্রমিকের জন্য অবাধ ট্রেড ইউনিয়নের নিশ্চয়তা বিধান করা। ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে সংখ্যার সীমাবদ্ধতা দূর করা এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে সহজ করা।
- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত জখমের কারণে নিহত বা আহত হওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে আইএলও কনভেনশন ১২১, শ্রমিকের সারা

জীবনের আয়, রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা, ক্ষতিপূরণ বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের বিভিন্ন আদেশ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ক্ষতিপূরণের মানদন্ড নির্ধারণ করা। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার জন্য ন্যূনতম ক্ষতিপূরণ ৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা।

- নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা বিশেষ করে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নিশ্চিত করতে কঠোর বিধি-বিধান যুক্ত করা। নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাসে উন্নীত করা।
- জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের বিধান শ্রম আইনে যুক্ত করা।
- শ্রমিক অধিকার নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মরত ট্রেড ইউনিয়ন, মানবাধিকার সংগঠন ও পেশাজীবি সংগঠন, বিভিন্ন ফোরাম ও নেটওয়ার্কসমূহের প্রস্তাবনা বিবেচনা করা।

প্রকাশনায়:

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স
বাড়ী নং- ২০, রোড নং- ১১ (নতুন), ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা- ১২০৯
ফোন: +৮৮-০২-৯১৪৩২৩৬, ৯১২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৫৮১৫২৮১০
ই-মেইল : bils@citech.net, ওয়েবসাইট: www.bilsbd.org